

আল্লাহ্ তা'আর অস্তিত্বের দশটি প্রমাণ



হযরত মিরযা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)

আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের দশটি প্রমাণ

প্রণেতা:

হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)

আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের দশটি প্রমাণ



গ্রন্থস্বত্ব	ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.
প্রকাশনায়	আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মূল	হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)
ভাষান্তর	মরকযী বাংলা ডেস্ক
প্রকাশকাল	জুন, ২০২৫
সংখ্যা	২০০০ কপি
মুদ্রণে	ইন্টারকন এসোসিয়েটস্ ৪৫/এ, নিউ আরামবাগ মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Ten Proofs
for the
Existence of
God

আল্লাহ্ তা'লার
অস্তিত্বের
দশটি প্রমাণ

by
Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad^(ra.)
Khalifatul Masih (II)

1st Published in Bangladesh in June 2025

Translated into Bangla by
Markazia Bangla Desk

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh
© Islam International Publications Ltd., U. K.

ISBN 978-984-991-221-7

ভূমিকা

আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও যুক্তির প্রাধান্য একদিকে যেমন অভূতপূর্ব অগ্রগতি বয়ে এনেছে, তেমনই অন্যদিকে তা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে একটি গভীর প্রশ্নচিহ্ন অঙ্কন করেছে। বিশেষকরে বিশ্বস্রষ্টা, জগৎ-নিয়ন্ত্রক বা আল্লাহ্ তা'লার মহান অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় ও বিতর্ক ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুবাদী দর্শন, মানবকেন্দ্রিক জীবনদর্শন এবং অভিজ্ঞতানির্ভর যুক্তিবাদ অনেকের চিন্তাজগতে এ মর্মে একটি ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট— যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তা বিশ্বাসযোগ্যও নয়। এ প্রেক্ষিতে ধর্ম, বিশেষত একত্ববাদী ধর্মবিশ্বাস আজ এক গভীর প্রশ্নের সম্মুখীন।

এই পটভূমিতে হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-এর প্রণীত “আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের দশটি প্রমাণ” পুস্তিকায় উপস্থাপিত দশটি যুক্তি একক মাত্রায় উপস্থাপিত নয়, বরং এগুলো বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্মিলন। এখানে রয়েছে দার্শনিক ভিত্তিতে নির্মিত তাত্ত্বিক যুক্তি, বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, মানবচরিত্রের অন্তর্নিহিত ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, কুরআনিক বক্তব্য এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থাপিত গভীর বিশ্লেষণ। লেখক প্রত্যেক যুক্তিকে সুচিন্তিতভাবে দাঁড় করিয়েছেন, যাতে তা আধুনিক মনন ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং সংশয়বাদীদের প্রশ্নের যৌক্তিক উত্তরও প্রদান করে।

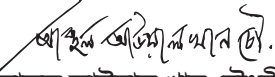
এই রচনার একটি বিশেষ দিক হলো, এটি কেবল অবিশ্বাসীদের জবাব প্রদানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিশ্বাসীদের ঈমানকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সুদৃঢ় করার একটি সচেতন প্রয়াসও বটে। তদুপরি, এটি ধর্ম ও বিজ্ঞানের কথিত দ্বন্দ্বকে অসার প্রমাণ করে দেখায়— আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন এক অন্ধ অনুকরণের নাম নয় বরং এটি যুক্তি, অভিজ্ঞতা এবং আন্তরিক উপলব্ধির একটি স্বাভাবিক পরিণাম।

সার্বিকভাবে, এই পুস্তিকাটি একাধারে একটি বিশ্বাসনির্ভর পর্যালোচনার দলিল, একটি দার্শনিক পর্যালোচনা এবং একটি আত্মিক আহ্বান। বর্তমান সময়ের

নিরিখে এটি শুধু একটি চিন্তার খোরাক নয় বরং এক অনুসন্ধানী অভিযাত্রা, যা এক নির্মল হৃদয় ও বিবেককে আলোড়িত করতে সক্ষম।

আশা করি, পাঠক এই পুস্তিকা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে আরো গভীর বিশ্বাস ও উপলব্ধি লাভ করতে সক্ষম হবেন।

এ পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে যারাই অবদান রেখেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ তা'লা উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, আমীন।


আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ঢাকা

জুন, ২০২৫

প্রকাশকের নিবেদন

“আল্লাহ্ তা’লার অস্তিত্বের দশটি প্রমাণ” শীর্ষক পুস্তিকাটি হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ, আহমদ খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) নাস্তিকদের এই আপত্তির জবাবে লিখেছেন যে, “আল্লাহ্র অস্তিত্ব যদি থেকেই থাকে তাহলে আমাদেরকে দেখিয়ে দাও, তাহলেই আমরা বিশ্বাস করব।” এই পুস্তিকাটি সর্বপ্রথম ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। আল্লাহ্ তা’লার সত্তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি এতে লেখেন, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না। অতএব ইন্দ্রিয়গত সীমাবদ্ধতায় যেক্ষেত্রে তাঁকে ধরা যায় না, সেক্ষেত্রে এমন সীমা আরোপ কীভাবে যুক্তিসংগত হতে পারে? আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য অন্যান্য মাধ্যম ও প্রমাণ আছে। এই সূত্রে তিনি দশটি এমন যুক্তি উপস্থাপন করেন যা আল্লাহ্র অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ বহন করে।

যুগের প্রয়োজনে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আই.) এই পুস্তিকাটি পুনঃপ্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশে ‘নাযারাতে নাশর ও ইশায়াত’ এই পুস্তিকাটি প্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করেছে। আল্লাহ্ তা’লা এই প্রকাশনাকে সার্বিক দিক থেকে বরকতময় করুন এবং হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়ে দিন।

হাফিয মখদুম শরীফ

নাযারাতে নাশর ও ইশায়াত, কাদিয়ান

লেখক পরিচিতি



প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর দ্বিতীয় খলীফা হযরত আলহাজ্জ মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম এবং জীবন প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর একটি ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতার স্বাক্ষর বহন করে। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে এই প্রতিশ্রুত সন্তানের বায়ান্নটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ছিল। তাঁর রচিত কুরআন শরীফের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসংবলিত ‘তফসীরে সগীর’ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যাসংবলিত ‘তফসীরে কবীর’ তাঁর অম্লান স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

তিনি ১৯৩৪ সালে ‘তাহরীকে জাদীদ’ স্কীম আরম্ভ করে সমগ্র বিশ্বে আহমদীয়া মসজিদ ও ইসলাম প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখেন। তিনি এই জামা’তের কয়েকটি অঙ্গসংগঠন প্রতিষ্ঠা করে জামা’তকে সাংগঠনিকভাবে অনেক বেশি বলিষ্ঠ ও সুসংহত করেন। তাঁর খেলাফতকালে এই ঐশী জামা’ত বিশ্বের ৭৫টি দেশে বিস্তৃতি লাভ করে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় খলীফা তাঁর ৫২ বছর দীর্ঘ ঐতিহাসিক ও কল্যাণময় খেলাফতকাল অতিবাহিত করে ০৮ নভেম্বর ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের রাবওয়ায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ

বর্তমান যুগে বিশ্বাস ও ঈমানী বিষয়াদি সম্পর্কে বস্তুবাদি লোকেরা যে-সব আপত্তি উত্থাপন করে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো ‘স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা’। মুশরিকরা সেগুলোকে (তথাকথিত উপাস্যদের- অনুবাদক) খোদার অংশীদার বানাতেও অন্ততপক্ষে তারা খোদা তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে। পক্ষান্তরে নাস্তিকরা খোদাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। বর্তমান বিজ্ঞান সবকিছুর ভিত্তি রেখেছে দর্শন-পর্যবেক্ষণের ওপর। তাই নাস্তিকরা প্রশ্ন করে যে, খোদা যদি থেকে থাকেন তাহলে আমাদের দেখাও, না দেখে আমরা তাঁকে কীভাবে মানতে পারি? যুগের হাওয়া যেহেতু অধিকাংশ যুবকের হৃদয় থেকে সেই পবিত্র সত্তার ধারণা মুছে দিয়েছে এবং কলেজপড়ুয়া শত শত শিক্ষার্থী, ব্যারিস্টার ও অন্যান্যরা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র অস্তিত্ব অস্বীকার করে বসেছে আর তাদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এছাড়া হাজার হাজার মানুষ এমন রয়েছে, যারা বাহ্যত জাতি ও রাষ্ট্রের ভয়ে প্রকাশ না করলেও বাস্তবিকপক্ষে হৃদয়ে খোদার প্রতি কোনো বিশ্বাসই রাখে না। তাই আমি মনস্ত্রির করেছি, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সুযোগ দিলে এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করব। হয়ত কোনো পুণ্যবান মানুষ এ থেকে উপকৃত হবে।

১। নাস্তিকদের প্রথম প্রশ্ন হলো, আমাদেরকে যদি খোদা দেখাতে পারো তাহলে আমরা মানবো।

এ প্রশ্ন বেশ অনেকবার আমার শোনার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু সদা এটি শুনে আমি আশ্চর্যই হই। মানুষ বিভিন্ন জিনিসকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করে থাকে। কোনো জিনিসকে দেখে, কোনোটিকে স্পর্শ করে, কোনোটিকে শুঁকে, কোনোটিকে শুনে, আবার কোনোটিকে আস্বাদন করে। রং দেখে চেনা যায়, ঘ্রাণ নিয়ে বা স্পর্শ করে কিংবা চেখে নয়।

কাজেই যে ব্যক্তি বলে, ‘রং-কে আমি তখন রং বলে বিশ্বাস করব যখন তুমি আমাকে এর আওয়াজ শোনাবে- সেই ব্যক্তি কি নির্বোধ নয়? অনুরূপভাবে আওয়াজ বুঝা যায় শুনে। আর যে বলে, ‘আমাকে অমুক ব্যক্তির আওয়াজ দেখিয়ে দাও, দেখে আমি মানবো যে, সে কথা বলে’- এমন মানুষ কি অজ্ঞ নয়? একইভাবে সুগন্ধি ঘ্রাণ নেবার মাধ্যমে অনুভূত হয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি দাবি করে, ‘তুমি আমাকে গোলাপের সুগন্ধি আশ্বাদন করিয়ে দিলেই তবে আমি মানবো- এমন লোক কি জ্ঞানী আখ্যায়িত হতে পারে? অপর দিকে আশ্বাদন করে উপলব্ধি করা বিভিন্ন জিনিস যেমন- অল্পতা, মিষ্টতা, তিক্ততা ও নোনতা স্বাদ কেউ যদি শুঁকে নিতে চায় তাহলে কখনও সে এটি করতে পারবে না। অতএব যে জিনিস দৃষ্টিগোচর হয়, সেটিকে আমরা মেনে নেব আর যে জিনিস দৃষ্টিগোচর হবে না, সেটিকে মানবো না- এমনটি সঠিক নয়। অন্যথায় এভাবে গোলাপের সুবাস, লেবুর অল্পতা, মধুর মিষ্টতা, ঘৃতকুমারী (তথা অ্যালোভেরা)-এর তিক্ততা, লোহার কাঠিন্য এবং কণ্ঠের সুর- এ সবকিছুকেই অস্বীকার করতে হবে, কেননা এসব জিনিস দেখা যায় না বরং শুঁকে, চেখে, স্পর্শ করে ও শুনে বুঝতে হয়। অতএব এটি কত বড়ো ভ্রান্ত একটি আপত্তি যে, আমাদেরকে দেখাও তাহলে আমরা মানবো- এমনসব আপত্তিকারী গোলাপের সুবাস ও মধুর মিষ্টতা কি দেখে মানে? তাহলে আল্লাহ্ তা'লার সত্তা দেখালে মানবো- এই শর্তারোপের কারণ কী?

এছাড়াও মানবদেহে এমনসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে যেগুলোকে না দেখেই সে মানে এবং মানতে বাধ্য। সব মানুষ কি তাদের হৃৎপিণ্ড, কলিজা, মগজ, নাড়িভুঁড়ি, ফুসফুস ও প্লীহা ইত্যাদি দেখে বিশ্বাস করে, নাকি না দেখে? এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখানোর জন্য যদি বের করা হয় তাহলে মানুষ তখনই মারা যাবে আর দেখার সুযোগই হবে না।

এসব উদাহরণ আমি একথা স্পষ্ট করার জন্য দিয়েছি যে, দেখে সব কিছু জানা যায় না বরং পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সেগুলো বোঝা যায়। এখন আমি বলছি, এমন অনেক জিনিসও আছে, যেগুলো সরাসরি এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমেও জানা সম্ভব নয় বরং সেগুলোর জানার মাধ্যম ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- বুদ্ধি বা স্মৃতিশক্তি কিংবা মানসপট এমন জিনিস, যেগুলোকে পৃথিবীর কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু কেউ কি কখনও বুদ্ধিকে দেখেছে, শুনেছে, চেখেছে, শুঁকেছে বা ছুঁয়েছে? তাহলে বুদ্ধি নামে কোনো জিনিস রয়েছে অথবা স্মরণশক্তি বলেও কোনো কিছু আছে- তা কীভাবে জানা গেল? এরপর শক্তিকেই ধরো, প্রতিটি মানুষের মাঝেই কমবেশি শক্তি রয়েছে। কেউ দুর্বল হোক বা সবল- সে কিছু না কিছু শক্তি অবশ্যই রাখে। প্রশ্ন হলো, কেউ কি আজ পর্যন্ত ‘শক্তি’ দেখেছে বা শুনেছে অথবা স্পর্শ করেছে কিংবা চেখেছে? তাহলে কীভাবে বোঝা

গেল— শক্তি বলেও কিছু রয়েছে? এ বিষয়টি একজন অজ্ঞ থেকে চরম অজ্ঞ লোকও বুঝতে পারে যে, এসব জিনিসকে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তি দিয়ে উপলব্ধি করি নি বরং এগুলোর কার্যকারিতা উপলব্ধি করে এগুলো সম্পর্কে জেনেছি। উদাহরণস্বরূপ আমরা যখন দেখলাম, মানুষ বিভিন্ন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে এমন কোনো কৌশল বের করে, যার মাধ্যমে সে তার বিপদাপদ দূর করতে সক্ষম হয়। এভাবে বিপদাপদের সমাধান হতে দেখে আমরা বিশ্বাস করলাম— মানুষের মাঝে এমন কোনো জিনিস রয়েছে যা এমন পরিস্থিতিতে তার কাজে লাগে। অতএব আমরা সেই জিনিসের নাম রেখেছি ‘বুদ্ধি’। অতএব বুদ্ধিকে আমরা সরাসরি পঞ্চেন্দ্রিয়ার কোনো একটি দিয়েও আবিষ্কার করি নি বরং এর কার্যকারিতা দেখে এ সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি। অনুরূপভাবে আমরা যখন মানুষকে বড়ো বড়ো বোঝা উঠাতে দেখেছি তখন বুঝেছি, তার মাঝে এমন কোনো উপাদান রয়েছে যার সুবাদে সে বোঝা বহন করতে পারে, নিজের চেয়ে দুর্বল জিনিসকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারে আর এর নাম রেখেছি ‘শক্তি’ বা ‘সামর্থ্য’।

একইভাবে যত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জিনিসের কথাই ধরো না কেন, সেগুলোর অস্তিত্ব মানুষের জন্য অদৃশ্যই থাকবে আর সদা সেগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যাবে সেগুলোর কার্যকারিতা থেকে— দেখে, শুঁকে, চেখে বা স্পর্শ করে নয়।

অতএব সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম সত্তা আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে জানার জন্য ‘চোখে না দেখা পর্যন্ত তাঁকে মানবো না’— এমন শর্ত আরোপ করা কীভাবে সংগত হতে পারে। কেউ কি কখনও বিদ্যুৎ দেখেছে?

এছাড়া বিদ্যুতের সাহায্যে যে তারবার্তা পৌঁছে বা মেশিন চলে অথবা আলোকিত করা হয়, সেটিকে কি অস্বীকার করা সম্ভব? ইথারের গবেষণা পদার্থবিদ্যার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা কি আজ পর্যন্ত একে দেখা, শোনা, শোঁকা, স্পর্শ করা বা চেখে দেখার কোনো মাধ্যম আবিষ্কার করেছে? অথচ এর অস্তিত্ব না মানলে এ বিষয়ের সমাধানই হতে পারে না যে, সূর্যের আলো পৃথিবীতে কীভাবে পৌঁছে? আর এতসব সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও বলা হয়, খোদাকে দেখিয়ে দাও তাহলে মানবো— এটি কত বড়ো অন্যায়! আল্লাহ্ দৃষ্টিগোচর হন, তবে সেসব চোখে যেগুলো তাঁকে দেখার সামর্থ্য রাখে। হ্যাঁ! কেউ যদি তাঁকে দেখার আকাঙ্ক্ষা রাখে তাহলে (জেনে রেখো,) তিনি নিজ শক্তিমত্তা ও ক্ষমতারাজির আয়নায় জগদ্বাসীর সামনে বিদ্যমান রয়েছেন এবং গুপ্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি সবচেয়ে বেশি প্রকাশ্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়টি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু অনন্য আঙ্গিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

(আল-আনআম: ১০৪) لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সত্তা এমন, দৃষ্টি যার নাগাল পেতে পারে না বরং তিনিই দৃষ্টির কাছে ধরা দেন আর তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সর্বাধিক জ্ঞাত। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে এদিকে মনোযোগী করেছেন যে, তোমাদের দৃষ্টি খোদাকে দেখার যোগ্যতা রাখে না, কেননা তিনি সূক্ষ্মতম সত্তা আর সূক্ষ্ম জিনিস তো দেখা যায় না। যেমন, শক্তি, বুদ্ধি, আত্মা, বিদ্যুৎ ও ইথার ইত্যাদি। এসব জিনিস কখনও কারও দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহলে খোদার সূক্ষ্মতম সত্তা পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টি কীভাবে পৌঁছাতে পারে? অতএব প্রশ্ন হলো, মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'লাকে দেখার উপায় কী এবং তাঁর তত্ত্বজ্ঞান কীভাবে লাভ করা যেতে পারে? এর উত্তরে (আল্লাহ্) বলেন, وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ অর্থাৎ, তিনি স্বয়ং দৃষ্টিতে ধরা দেন। মানবীয় দৃষ্টিশক্তি যদিও দুর্বলতার কারণে তাঁর গভীরতা উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয় না, তা সত্ত্বেও তিনি নিজ শক্তিমত্তা ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ এবং পরমোৎকর্ষ গুণাবলির বিকাশের মাধ্যমে নিজেই স্বীয় সত্তাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। মানবীয় দৃষ্টি তাঁকে দেখার অযোগ্য হলেও তিনি নিজে তাঁর অসীম শক্তি ও ক্ষমতাবলে বিভিন্ন আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করেন। যেমন কখনও শাস্তিমূলক বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে, কখনও নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) মাধ্যমে, কখনও অনুগ্রহের নিদর্শনাবলি হিসেবে, আবার কখনও দোয়া কবুল করার মাধ্যমে।

এখন এ বিষয়টি প্রমাণ করার পরও যদি আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা আমাদের তাঁকে দেখানোর ওপর নির্ভর করে এবং না দেখে কোনো জিনিসকে বিশ্বাস করা না যায় তাহলে জগতের প্রায় ৪-৫টি জিনিসকে, বরং কোনো কোনো দার্শনিকের ভাষ্য অনুযায়ী তো সব জিনিসকেই অস্বীকার করতে হবে, কেননা তাদের বিশ্বাস হলো— পৃথিবীতে কোনো জিনিসই দৃষ্টিগোচর হয় না বরং কেবল গুণাবলিই প্রকাশ পায়। এ বিষয়টি প্রমাণ করার পর এখন আমি এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি যে, সেই যুক্তিপ্রমাণগুলো কী কী যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় এবং মানুষের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে, আমার স্রষ্টা অন্য কেউ, আমি নিজেই নিজের স্রষ্টা নই।

প্রথম প্রমাণ

‘পবিত্র কুরআন আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের সকল পন্থা বলে দিয়েছে’- আমি আমার এ বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের যুক্তিপ্রমাণ পবিত্র কুরআন থেকেই উপস্থাপন করব। দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সেই সামর্থ্য দান করুন। পৃথিবীতে জন্মলাভের পর মানুষ যেহেতু সর্বপ্রথম কানের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে, তাই আমিও সর্বপ্রথম শ্রুতির সাথে সম্পর্ক রাখে- এমন প্রমাণই নিচ্ছি।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের একস্থানে বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَوَّيَ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ
وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا الْفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
(আল-আলা: ১৫-২০)

অর্থাৎ সেই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করেছে এবং সে তার প্রতিপালক-প্রভুকে মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে আর শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তিই নয় বরং কার্যত ইবাদত করে নিজ স্বীকৃতির প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। আর তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো অথচ শেষটা যদি ভালো হয় কেবল তবেই সেটিকে প্রকৃত অর্থে ভালো বা মঙ্গল বলা যায় এবং তা দীর্ঘস্থায়ীও হয়ে থাকে। এ বিষয়টি কেবল পবিত্র কুরআনই উপস্থাপন করে না বরং পূর্ববর্তী সকল (ঐশী) গ্রন্থেও এ দাবি বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- ইবরাহীম (আ.) এবং মুসা (আ.) জগদ্বাসীর সামনে যে শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন, তাতেও এ শিক্ষাই রয়েছে।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের বিরোধীদের সামনে এই অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যে, যারা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার উর্ধ্বে থাকে, খোদার সন্তায় বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর সত্যিকার আনুগত্য করে, তারা সদা সফল ও বিজয়ী হয়। এ শিক্ষার সত্যতার প্রমাণ হলো, এ বিষয়টি পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতেও সমানভাবে বিদ্যমান। অতএব সেই যুগের বড়ো বড়ো ধর্মমত- খ্রিষ্টান, ইহুদী এবং মন্কার কাফেরদের মুখ বন্ধ করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত মুসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বলে, তাদেরকে তো তোমরা মান্য করে থাকো, তারাও তো একই শিক্ষাই দিয়েছেন। অতএব পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের অনেক বড়ো প্রমাণ হিসেবে একথাও উপস্থাপন করেছে যে, সকল ধর্ম খোদার অস্তিত্বের বিষয়ে একমত আর এটি সকল জাতির মৌলিক বিশ্বাস। তাই এই প্রমাণ নিয়ে যত বেশি প্রণিধান করা হয় ততই স্পষ্ট ও সত্য মনে হয়। বাস্তবে পৃথিবীর সবগুলো ধর্মই এ বিষয়ে একমত যে, এমন কোনো

সভা রয়েছেন যিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। নানান দেশ এবং অবস্থার পরিবর্তনের কারণে চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের মাঝেও তারতম্য দেখা দেয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও যতগুলো ঐতিহাসিক ধর্মমত রয়েছে এর সবগুলোই আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের বিষয়ে একমত, যদিও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে তাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। বর্তমান ধর্মগুলো তথা ইসলাম, খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদীধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, শিখধর্ম, হিন্দুধর্ম এবং পারসি তথা জরথুষ্ট্রধর্ম— এককথায় এদের সবাই এক খোদা, এলোহিম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, সদগুরু অথবা ইয়াযদান-এ বিশ্বাসী। আর যে-সব ধর্ম ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেগুলো সম্পর্কেও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায়, সেগুলোর প্রত্যেকটি এক খোদার মান্যকারী ও এক খোদায় বিশ্বাসী ছিল। হোক সে ধর্ম আমেরিকার বিচ্ছিন্ন দেশে সৃষ্ট বা আফ্রিকার অরণ্যে অথবা রোমে বা যুক্তরাজ্যে কিংবা জাভা ও সুমাত্রায় বা জাপান ও চীনে অথবা সাইবেরিয়া ও মঙ্গোলিয়ায় সৃষ্ট। এসব ধর্মমতের মাঝে মতৈক্য কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো? আর কে ছিল যে আমেরিকার অধিবাসীদেরকে ভারতবর্ষের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অথবা চীনের অধিবাসীদেরকে আফ্রিকানদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অবগত করেছে? পূর্বের যুগে রেলগাড়ি এবং ডাক ও তারবার্তার এমন ব্যবস্থা ছিল না যা এ যুগে আছে। এছাড়া এভাবে এত ব্যাপক পরিসরে জাহাজের যাতায়াতও ছিল না, বরং বাহন হিসেবে ঘোড়া ও খচ্চর ব্যবহৃত হতো। পালতোলা (নৌ) জাহাজ বর্তমান যুগের এক দিনের পথ কয়েক মাসে সম্পন্ন করত। এছাড়া অনেক অঞ্চল তখনও আবিষ্কৃতই হয় নি। প্রশ্ন দাঁড়ায়— ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা, প্রথা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং একে অপরের সম্পর্কে অনবহিত দেশসমূহের মাঝে এই একটি বিশ্বাসে ঐকমত্য কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো? যেক্ষেত্রে মনগড়া কল্পকাহিনির বিষয়ে দুইজন মানুষেরও একমত হওয়া কঠিন, সেক্ষেত্রে এতগুলো জাতি ও দেশের মধ্যে ঐকমত্য, যারা পরস্পরের মাঝে ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমও রাখত না— এ বিষয়ের প্রমাণ নয় কি যে, এই ধর্মবিশ্বাস একটি বাস্তব ঘটনা এবং কোনো অজানা মাধ্যমে প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে যার রহস্য ইসলাম খুলে দিয়েছে! ইতিহাসবিদরা এ বিষয়ে একমত যে, বিভিন্ন জাতির ঐতিহাসিকদের মাঝে যে বিষয়ে মতৈক্য হয়, সেটির যথার্থ হবার বিষয়ে তারা কোনো সন্দেহ করে না। আর কোনোকিছু দেখার পরই যেহেতু সারা পৃথিবীর মানুষ এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েছে, তাই এ বিষয়ে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ জাতিগোষ্ঠী একমত হওয়া সত্ত্বেও কেন এই বিশ্বাস পোষণ করা হবে না?

দ্বিতীয় প্রমাণ

আল্লাহ্ তা'লার মহাপবিত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআন দ্বিতীয় যে প্রমাণ উপস্থাপন করেছে তা এসব আয়াত থেকে বুঝা যায় যে,

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ ۖ إِنَّ رَبَّكَ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ
وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ۚ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَاسَ ۖ كُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۚ وَاسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيُؤُسَ وَلُوطًا ۖ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ
(আল-আনআম : ৮৪-৮৭)

কয়েক আয়াত পরে আবার বলেছেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۚ (সূরা আল্ আনআম: ৯১)

অর্থাৎ এটি ছিল আমাদের অকাট্য যুক্তি যা আমরা ইবরাহীমকে তার জাতির বিরুদ্ধে দান করেছিলাম। আমরা যাকে চাই মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক-প্রভু পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। আর আমরা তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব দান করেছিলাম। (তাদের) সবাইকে আমরা হিদায়াত দিয়েছিলাম বা সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম আর এর পূর্বে আমরা নূহকেও সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম এবং তার (অর্থাৎ ইবরাহীমের) বংশধর থেকে দাউদ ও সুলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা এবং হারুনকেও। বস্তুত আমরা সৎকর্মশীলদের সাথে এমনই ব্যবহার করে থাকি। আর যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলইয়াসকেও (সঠিক) পথ দেখিয়েছিলাম। আর তারা সবাই সৎকর্মশীল ছিল। আর ইসমাঈল, ইয়াসাআ এবং লূতকেও (সত্য) পথ দেখিয়েছিলাম। আর তাদের সবাইকে আমরা সমসাময়িক লোকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

এরপর বলেন, এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত দিয়েছেন, অতএব তুমি তাদের রীতির অনুসরণ করো।

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, এমন পুণ্যবান ও পবিত্র লোকেরা যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেন তা মানা উচিত নাকি সেই কথা যা অজ্ঞরা বলে থাকে তা (মানা উচিত)? অধিকন্তু এদের (বাজে) চালচলনের সাথে তাঁদের চালচলনের কোনো তুলনাই হয় না।

সোজা কথা হলো, তাঁদের কথাকেই গুরুত্ব দেওয়া হবে যারা নিজেদের চালচলন এবং কর্মকাণ্ড দ্বারা জগতের সামনে নিজেদের পুণ্য, পবিত্রতা এবং পাপাচার থেকে মুক্ত থাকা ও মিথ্যা এড়িয়ে চলা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। কাজেই প্রত্যেকের জন্য আবশ্যিক হলো, তাঁদেরই অনুসরণ করা এবং তাঁদের বিপরীতে অন্য লোকদের কথা অস্বীকার করা। যেমন— আমরা দেখি, যত পুণ্য এবং নৈতিকতার প্রচারক অতীত হয়েছেন এবং যারা নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষের মাঝে নিজেদের সততা প্রমাণ করেছেন, তারা সবাই একথার সাক্ষ্য দেন যে, এমন এক সত্তা রয়েছেন যাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় আল্লাহ্ অথবা গড বা পরমেশ্বর বলা হয়। ভারতের পুণ্যাত্মা রামচন্দ্র (আ.), শ্রীকৃষ্ণ (আ.), ইরানের পবিত্রাত্মা জরথুষ্ট্র (আ.), মিশরের পুণ্যবান (নবী) মূসা (আ.), নাসারার পুণ্যবান (নবী) মসীহ (আ.), পাঞ্জাবের একজন পবিত্রাত্মা নানক (রাহ.), এরপর সকল পুণ্যবানের মাথার মুকুট আরবের জ্যোতি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)— যাকে তাঁর জাতি আশৈশব সত্যবাদী উপাধি দিয়ে রেখেছিল আর যিনি বলেন,

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا (ইউনুস: ১৭)

অর্থাৎ, আমি তোমাদের মাঝে পুরো জীবন কাটিয়েছি, আমি মিথ্যা বলেছি মর্মে তোমরা কি কোনো প্রমাণ দিতে পারবে? তাঁর জাতি (তাঁর বিরুদ্ধে) কোনো আপত্তি উত্থাপন করে নি আর তাঁরা ছাড়াও শতসহস্র পুণ্যবান ব্যক্তি, যারা বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন, সবাই একবাক্যে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন— এক খোদা আছেন। আর শুধু এটিই নয় বরং বলেছেন, আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং তাঁর সাথে বাক্যালাপ করেছি। বড়ো বড়ো দার্শনিক— যারা পৃথিবীতে কোনো কাজ করেছেন, তারা তাঁদের একজনের কাজের এক সহস্রাংশও উপস্থাপন করতে পারবে না বরং তাঁদের এবং দার্শনিকদের জীবনী যদি তুলনা করা হয় তাহলে দার্শনিকদের জীবনে কথার চেয়ে আমলের অধ্যায় খুব কমই দৃষ্টিগোচর হবে। তাঁরা যে সত্য ও সততা প্রদর্শন করেছেন তা দার্শনিকদের জন্য দেখানো কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে? তারা লোকদেরকে পুণ্যের শিক্ষা দেয় বটে, কিন্তু নিজেরা মিথ্যা পরিহার করে না। এর বিপরীতে আমি যাদের নাম ওপরে উল্লেখ করেছি, (তাঁরা) পুণ্যের খাতিরে শতসহস্র দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু কখনও তারা দোদুল্যমান হন নি। তাঁদের বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। তাঁদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। তাঁদেরকে অলিগলি এবং বাজারঘাটে লাঞ্চিত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। পুরো জগৎ তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তা সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নি আর কখনও মানুষের ভয়ে মিথ্যা বলে নিজেদের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করেন নি। তাঁদের কর্ম, তাঁদের প্রতি জগদ্বাসীর ঘৃণা, লোক-দেখানো বিষয়াদি থেকে দূরে থাকা একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তাঁরা নিঃস্বার্থ ছিলেন আর প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার বশে কোনো কাজ তারা করতেন না। কাজেই এমন

সত্যবাদী এবং এমন বিশ্বস্ত লোকেরা যদি একবাক্যে বলেন, আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তাঁর বাণী শুনেছি এবং তাঁর বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছি তাহলে কারো কাছে তাদের বক্তব্য অস্বীকার করার (এমন) কী কারণ থাকতে পারে? যাদেরকে আমরা প্রত্যহ মিথ্যা বলতে শুনি তারাও যদি কয়েকজন একত্রিত হয়ে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তো তা-ও মানতেই হয়। যাদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা একেবারেই অজ্ঞাত, তারা পত্রপত্রিকায় নিজেদের গবেষণা প্রকাশ করলে তা আমরা মেনে নেই ঠিকই, কিন্তু মানবো না শুধু সেসব পুণ্যবানদের বক্তব্য। জগৎ বলে, লন্ডন (নামে) একটি শহর আছে আর আমরা তা মেনে নেই। ভূগোলবিদরা লেখেন, আমেরিকা একটি মহাদেশ আর আমরা এর সত্যায়ন করি। পর্যটকরা বলে সাইবেরিয়া একটি বিস্তীর্ণ জনবসতিহীন অঞ্চল, আমরা তা অস্বীকার করি না। কেন (অস্বীকার করি না)? কারণ হলো, এসবের অনুকূলে অনেক মানুষই সাক্ষ্য দিয়েছেন। অথচ এসব সাক্ষী মিথ্যাবাদী নাকি সত্যবাদী— আমরা তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নই। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে চাক্ষুষ সাক্ষ্যদাতা হচ্ছেন সে-সব মানুষ যাদের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তাঁরা নিজেদের প্রাণ, সম্পদ, স্বদেশ, মানসম্মানকে পদদলিত করে বিশ্বের দরবারে পুণ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা সত্ত্বেও সেসব পর্যটক ও ভূগোলবিদদের কথা মেনে নেওয়া এবং এসব পবিত্রতাদের কথা না মানা কোথাকার সত্যতা? কয়েকজনের কথা শুনে যদি লন্ডনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হতে পারে তাহলে শতসহস্র পুণ্যবান মানুষের সাক্ষ্য সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব কেন প্রমাণ হতে পারে না?

বহুত শতসহস্র পুণ্যবান সাক্ষী, যারা নিজেদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকে খোদা তা'লার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেন, তা কোনোভাবেই খণ্ডনযোগ্য হতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যারা দিবানিশি এ গলিতে বসবাস করে, তারা সবাই একবাক্যে বলছেন— ‘খোদা আছেন’, কিন্তু যারা আধ্যাত্মিকতার জগৎ সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত, তারা বলে— ওদের কথা মেনো না যে, খোদা আছেন। অথচ সাক্ষ্য গ্রহণের নীতি অনুযায়ী দুইজন সমমানের সদাচারী মানুষও যদি একটি বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করতে গিয়ে বলে যে, আমি অমুক জিনিস দেখেছি তবে তার সাক্ষ্যকে ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্যের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে, যে বলে— আমি সেই জিনিস দেখি নি, কেননা হতে পারে তাদের মধ্য হতে একজনের দৃষ্টি সেই জিনিসের ওপর পড়ে নি। আর এটি অসম্ভব যে, একজন না দেখেও মনে করবে আমি দেখেছি। অতএব খোদাকে যারা দেখেছেন তাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাঁর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে দলিল বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় প্রমাণ

তৃতীয় প্রমাণ যা পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায় তা হলো, মানবপ্রকৃতি স্বয়ং খোদা তা'লার অস্তিত্বের একটি প্রমাণ। কেননা কোনো কোনো এমন পাপ আছে যেগুলো মানব প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে অপছন্দ করে। যেমন- মা, বোন এবং নিজের মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচার আর প্রশ্রাব, পায়খানা এবং এ ধরনের ময়লা-আবর্জনার সাথে সম্পৃক্ততা, এছাড়া রয়েছে মিথ্যাচার। এগুলো এমন জিনিস যা এক নাস্তিকও এড়িয়ে চলে- কিন্তু কেন? কোনো খোদা যদি না থাকেন তাহলে কেন (এড়িয়ে চলে)? মা, বোন এবং অন্য মহিলাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে বলে সে মনে করে কেন? মিথ্যাকে মন্দ জ্ঞান করে কেন? কোন সে যুক্তিপ্রমাণ যা উপর্যুক্ত জিনিসগুলোকে তার দৃষ্টিতে কুৎসিত করে তুলে ধরেছে? আর উর্ধ্বলোকের কোনো শক্তির প্রতাপ যদি তার হৃদয়ে না থাকে তাহলে সে সেগুলো পরিহার করে কেন? তার জন্য তো সত্য-মিথ্যা, অবিচার-সুবিচার সব একই হবার কথা এবং মন যা চায় তা-ই করবে। সেটি কোন শরীয়ত যা তার আবেগ অনুভূতির ওপর রাজত্ব করে, যা হৃদয়ে আসন গেড়েছে? একজন নাস্তিক যদিও মৌখিকভাবে তাঁর রাজত্ব থেকে বেরিয়ে যাবার দাবি করতে পারে, কিন্তু সে তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতি থেকে বের হতে পারবে না। পাপাচার থেকে বিরত থাকা অথবা সেগুলো প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা এর অনুকূলে একটি দলিল। কোনো বাদশাহর রাজত্বকে অস্বীকার করলেও বাদশাহর সামনে জবাবদিহিতার ভয় রয়েছে- যা তার হৃদয়ে ছেয়ে আছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

(আল-কিয়ামা: ২-৩) لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

অর্থাৎ মানুষ মনে করে, খোদাও নেই পুরস্কার বা শাস্তিও নেই, কিন্তু বিষয়টি এমন নয় বরং আমরা এসব বিষয়ের সাক্ষীস্বরূপ দুটি জিনিস উপস্থাপন করছি। প্রথম বিষয় হলো, প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি কিয়ামতের দিন নির্ধারিত আছে, যে-দিন সে বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় আর পুণ্যের প্রতিদান পুণ্যে, আর মন্দের প্রতিদান শাস্তির মাধ্যমে লাভ হয়। খোদা যদি না থাকেন তাহলে পুরস্কার-শাস্তি কীভাবে পাচ্ছে? আর যারা বড়ো কিয়ামতের অস্বীকারকারী তারা দেখে নিক যে, কিয়ামত এই পৃথিবী থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়। ব্যভিচারী ব্যক্তির যৌনরোগ ও গনেরিয়া হয়, বিবাহিত ব্যক্তির তা হয় না, অথচ উভয়ে একই কাজ করে থাকে। দ্বিতীয় সাক্ষ্য হলো, নফসে লাউওয়ামার। অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতি স্বয়ং এমন পাপকে খিকার দিয়ে বলে- এ বিষয়টি মন্দ ও নোংরা। ব্যভিচার এবং মিথ্যাকে নাস্তিকও মন্দ জ্ঞান করবে (আর) অহংকার এবং হিংসাকে ভালো মনে করবে না- কিন্তু কেন? তাদের কাছে তো কোনো শরীয়ত নেই।

কারণ হলো, তাদের হৃদয় (এগুলোকে) মন্দ জ্ঞান করে আর হৃদয়ের মন্দ জ্ঞান করার কারণ হলো, (তারা জানে) এই কাজের জন্য একজন উর্ধ্বতন বিচারকের পক্ষ থেকে আমরা শাস্তি পাবো, যদিও তারা ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারে না। এরই সমর্থনে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র **فَالْهَمُّهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا** (আশ-শামস: ৯) রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আত্মায় পুণ্য ও পাপের চেতনা-প্রেরণা অন্তর্নিহিত রেখেছেন। কাজেই ভালো ও মন্দের উপলব্ধি স্বয়ং খোদার (অস্তিত্বের) এক শক্তিশালী প্রমাণ বা দলিল। খোদা যদি না থাকেন তাহলে একটি জিনিসকে ভালো আর একটিকে মন্দ বলার কোনো কারণ নেই। মন যা চাইবে, মানুষ তা-ই করবে।

চতুর্থ প্রমাণ

পবিত্র কুরআন থেকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের যে চতুর্থ প্রমাণ সামনে আসে তা হলো,

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْبُتْتُهُي وَأَنَّ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي وَأَنَّ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا وَأَنَّ هُوَ خَلَقَ
الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تَأْنَسَىٰ (আল-নাজম: ৪৩-৪৭)

অর্থাৎ, আমরা প্রত্যেক নবীর মাধ্যমে একথা পৌঁছে দিয়েছি যে, প্রত্যেক বিষয় আল্লাহ্ তা'লার সন্তায় গিয়েই চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। তা আনন্দের বিষয় হোক বা দুঃখের (বিষয়), খোদার পক্ষ থেকেই তা আসে। জীবন-মৃত্যু সবই তাঁর হাতে। নারী-পুরুষ উভয়কে তিনিই সৃষ্টি করেছেন একটি তুচ্ছ তরল থেকে যখন তা ফেলা হয়েছে।

এসব উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন যে, প্রত্যেক কর্মেরই একজন কর্তা থাকে।

আর প্রতিটি কাজের কোনো কর্মী থাকা স্বাভাবিক বিষয়। অতএব এই গোটা বিশ্বজগতের প্রতি যদি অভিনিবেশ করো তাহলে অবশ্যই তোমার দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হবে যে, সকল বস্তু বা জিনিস অবশেষে গিয়ে খোদার সন্তায় মিলিত হয় আর তিনিই সবকিছুর পরম মার্গ এবং তাঁরই ইঙ্গিতেই এই সবকিছু হচ্ছে। যেমন- আল্লাহ্ তা'লা মানুষের প্রাথমিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের বলেছেন, একবিন্দু বীর্যের মাধ্যমে তোমার জন্ম হয়েছে। তোমরা যতটা পেছনে যাবে ততই নিজেদের হীন অবস্থা তোমাদের সামনে স্পষ্ট হতে থাকে; তাহলে প্রশ্ন হলো- তোমরা কীভাবে নিজেদের স্রষ্টা হতে পারো? স্রষ্টা ছাড়া যেহেতু কোনোকিছু সৃষ্টি হতে পারে না আর মানুষ তার

নিজের স্রষ্টা নয়, কেননা তার অবস্থার প্রতি যত বেশি অভিনিবেশ করবে (দেখবে যে,) সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ অবস্থা থেকে উন্নতি করে এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে। যেক্ষেত্রে সে বর্তমান অবস্থায় নিজের স্রষ্টা নয় সেক্ষেত্রে সেই দুর্বল অবস্থায় নিজের স্রষ্টা হতে পারত কীভাবে? অতএব স্বীকার করতেই হয় যে, তার স্রষ্টা অন্য কেউ— যাঁর শক্তি সামর্থ্য সীমাহীন এবং ক্ষমতা-মহিমা অপার। মোটকথা, মানুষের ক্রমোন্নতি নিয়ে যতই ভাববেন, তার উপকরণ ততই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দেখা যাবে, অবশেষে এক জায়গায় গিয়ে সকল পার্থিব জ্ঞান বলে বসে— এখানে আর আমাদের কোনো ভূমিকা নেই আর আমরা জানি না যে, এটি কীভাবে হলো বা কেন হলো আর সেই স্থানেই খোদার হাত সক্রিয় পরিদৃষ্ট হয়। অবশেষে একজন বিজ্ঞানীকে মানতে হয় যে **إِلَىٰ رَبِّكَ النُّتْهُي** অর্থাৎ সবকিছুরই একটা ইতি ঘটে আর এমন এক সত্তায় এসে তা ঘটে যাকে তারা নিজেদের জ্ঞানের আওতায় আনতে পারে না এবং তিনিই হলেন খোদা। এটি একটি স্থূল প্রমাণ, যা একজন চরম অজ্ঞ ব্যক্তিও বুঝতে পারে।

কথিত আছে, জনৈক ব্যক্তি এক বেদুঈনকে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘তোমার কাছে খোদার (অস্তিত্বের) কী প্রমাণ আছে?’ জবাবে সে বলে, ‘জঙ্গলে যদি উটের গোবর পড়ে থাকে তাহলে আমি (তা) দেখেই বলে দেই যে, এ পথ দিয়ে কোনো উট হেঁটে গেছে। তাহলে এত বড়ো সৃষ্টিজগৎ দেখে আমি কি বুঝতে পারব না যে, এর কোনো স্রষ্টা আছে?’*

সত্যিকার অর্থেই এটি একটি বাস্তবিক ও প্রকৃতিসম্মত জবাব আর এই সৃষ্টিকুলের সৃষ্টির প্রতি মানুষ যদি অভিনিবেশ করে তাহলে অবশেষে এমন এক সত্তাকে মানতে হয়— যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন।

পঞ্চম প্রমাণ

আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের পঞ্চম প্রমাণ যা পবিত্র কুরআনে উপস্থাপন করা হয়েছে যদিও তা একই ধরনের প্রমাণ কিন্তু পূর্বের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর এখানে আরো উত্তম প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। যেমন- আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

* **الْبُعْرَةَ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ وَأَثَرُ الْقَدَمِ عَلَى السَّفِيرِ فَالْسَّيَّءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ فَجَائٍ أَمَا تَدُلُّ عَلَى قَدِيرٍ**

تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۖ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۚ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سُلُوكٍ طَبَاقًا ۖ
مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ ثُمَّ
ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (আল-মুলক: ২-৫)

অর্থাৎ পরম কল্যাণময় সেই সত্তা— যাঁর হাতে সব আধিপত্য। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি পরীক্ষা করতে পারেন, তোমাদের মাঝে কে অধিক পুণ্যকর্ম করে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমশীল। তিনি সাত আকাশও সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোতে পারস্পরিক সাদৃশ্য এবং সামঞ্জস্য রেখেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কখনও কোনো অসংগতি দেখতে পাবে না। অতএব নিজের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখো, তুমি কি কোনো খুঁত দেখতে পাও? পুনরায় দৃষ্টিপাত করে দেখো, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসবে।

কতিপয় লোক বলে, এই পুরো বিশ্বজগৎ ঘটনাক্রমে সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং কাকতালীয়ভাবে বস্তু বা পদার্থের মিলিত হবার ফলে এ সবকিছু তৈরি হয়ে গেছে আর বিজ্ঞানের আলোকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, পৃথিবী আপনা-আপনিই যুক্ত হয়ে নিজেই নিজের যাত্রা অব্যাহত রাখবে আর এর পরিচালনাকারী কেউ থাকবে না— এমনটি সম্ভব। আর আল্লাহ্ তা'লা উক্ত আয়াতগুলোতে তাদের উত্তর প্রদান করেছেন যে, ঘটনাক্রমে সংযুক্ত বস্তুতে কখনও ধারাবাহিকতা এবং শৃঙ্খলা বজায় থাকে না বরং অসামঞ্জস্যতা থাকে। বিভিন্ন রঙের মিশ্রণে একটি চিত্র প্রস্তুত হয়, কিন্তু বিভিন্ন রং একটি কাগজের ওপর ফেলে দিলেই তাতে একটি চিত্র প্রস্তুত হয়ে যাবে কি? ইট দ্বারা বাড়ি নির্মিত হয়, কিন্তু ইটগুলোকে একটির ওপর আরেকটি রেখে দিলেই গৃহ নির্মিত হয়ে যাবে কি? তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, কিছু ঘটনা ঘটনাক্রমেও হয়ে যায়, কিন্তু বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনার শৃঙ্খলা দেখে কখনও কোনো মানুষ বলতে পারবে না, এ সবকিছু নিজে থেকেই সৃষ্টি হয়ে গেছে। মানলাম যে, নিজে নিজেই বস্তু বা পদার্থ থেকে ভূমি সৃষ্টি হয়ে গেছে আর এটিও মেনে নিলাম যে, ঘটনাক্রমেই মানুষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, কিন্তু মানুষের সৃষ্টির প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করো, এমন সম্পূর্ণ-পরিপূর্ণ সৃষ্টি কখনও আপনা-আপনি হতে পারে কি? সাধারণত পৃথিবীতে একটি বৈশিষ্ট্যের আকর্ষণের মাধ্যমে এর প্রস্তুতকর্তা সম্পর্কে জানা যায়। একটি উৎকৃষ্ট চিত্র দেখে তাৎক্ষণিকভাবে ধারণা হয় যে, কোনো বড়ো মাপের চিত্রশিল্পী এটি আঁকেছে। একটি

উৎকৃষ্ট রচনা দেখে বোঝা যায় যে, কোনো বড়ো মাপের লেখক তা লিখেছে। আর (শিল্পের সাথে) যতই (দর্শকের) সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায় ততই শিল্পী বা রচয়িতার বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য হৃদয়ে গেঁথে যেতে থাকে। তাহলে এমন সুবিন্যস্ত পৃথিবী নিজে থেকেই আর এমনতেই সৃষ্টি হয়ে গেছে- তা কীভাবে ভাবা যেতে পারে? এই বিষয়টির প্রতি একটু লক্ষ্য করো যে, মানুষের মাঝে যেখানে উন্নতি করার শক্তিবৃত্তি বিদ্যমান, সেখানে তাকে তার চিন্তাভাবনাসমূহকে বাস্তবায়িত করার জন্য মেধা দেওয়া হয়েছে আর তার দেহকেও সে অনুযায়ী বানানো হয়েছে। তার যেহেতু পরিশ্রম করে উপার্জন করার ছিল তাই তাকে বৈশিষ্ট্য বা অঙ্গ দিয়েছেন যেন চলাফেরা করে নিজের জীবনোপকরণ সৃষ্টি করে নিতে পারে। গাছের জীবনোপকরণ যদি মাটিতে রেখে থাকেন তাহলে তাকে শিকড় দিয়েছেন, যেন তা সেটির ভেতর থেকে নিজের পেট ভরতে পারে। বাঘের খাবার যদি মাংস নির্ধারণ করে থাকেন তাহলে তাকে শিকার করার জন্য নখ দিয়েছেন আর ঘোড়া ও গোরুর জন্য যদি ঘাস খাওয়া নির্ধারণ করে থাকেন তাহলে তাদেরকে এমন গলা দিয়েছেন যা ঝুঁকে ঘাস খেতে পারে অধিকন্তু উটের জন্য যদি গাছের পাতা এবং কাঁটা (খাদ্য হিসেবে) নির্ধারণ করে থাকেন তাহলে তার গলাও উঁচু করে সৃষ্টি করেছেন- এই সৃষ্টিযজ্ঞ কি ঘটনাচক্রে দৃশ্যপটে এসেছে? উটকে দীর্ঘ গলা, বাঘকে (নখরবিশিষ্ট) থাবা, গাছকে শিকড় ও মানুষকে পা (দিতে হবে)- ঘটনাচক্র কি এই বিষয়টি জেনে নিয়েছিল?

এছাড়া যে কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে গেছে তাতে এতটা বিন্যাস ও শৃঙ্খলা রাখা হয়েছে- এটি কি কখনও বোধগম্য হতে পারে? মানুষকে যদি ফুসফুস দিয়ে থাকেন তাহলে তার জন্য বায়ুও সৃষ্টি করেছেন। তার জীবন যদি পানির ওপর নির্ভরশীল করে থাকেন তাহলে সূর্যের মাধ্যমে মেঘ দ্বারা তার কাছে পানি পৌঁছে দিয়েছেন। আর (তাকে) যদি চোখ দিয়ে থাকেন তাহলে সেগুলোকে কল্যাণকর করার জন্য সূর্যের আলোও দিয়েছেন, যেন সে তাতে দেখতে সক্ষম হয়। তাকে কান দিয়ে একইসাথে সুমধুর সুরও সৃষ্টি করেছেন। জিহ্বা দেবার পাশাপাশি সুস্বাদু খাবারও দান করেছেন। নাক সৃষ্টি করে ঘ্রাণও সরবরাহ করেছেন। হয়ত ঘটনাচক্রে মানুষের মাঝে ফুসফুস সৃষ্টি করে থাকবে, কিন্তু প্রশ্ন হলো- তার জন্য এই বাতাসের ব্যবস্থা কীভাবে হয়ে গেল? চোখ সৃষ্টি হওয়া হয়ত সম্ভব ছিল, কিন্তু এটিও অদ্ভুত ঘটনাচক্র যে, কোটি কোটি মাইল দূরে একটি সূর্যও সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যেন চোখ নিজের কাজ করতে পারে। ঘটনাচক্রে যদি একদিকে কান সৃষ্টি করে থাকে তাহলে এটি কোন শক্তি ছিল যা অপরদিকে আওয়াজও সৃষ্টি করে দিয়েছে? মানলাম দৈবচক্র বরফাবৃত দেশগুলোতে কুকুর ও ভালুক সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সেসব কুকুর ও ভালুকের লোম শীত থেকে মুক্ত থাকার জন্য যতটা দীর্ঘ হওয়া দরকার ততটা দীর্ঘও হয়ে গেছে- এর কী কারণ? ঘটনাচক্রই

হাজারো ব্যাধি সৃষ্টি করেছে আবার ঘটনাচক্রই সেগুলোর আরোগ্য সৃষ্টি করেছে। ঘটনাচক্রই বিছুটি গাছ সৃষ্টি করেছে, যার স্পর্শে চুলকানি আরম্ভ হয় এবং তা-ই এর সাথে পালং শাকের চারা উদ্গত করেছে যেন তার চিকিৎসা হয়ে যায়। নাস্তিকদের ঘটনাচক্র বা দৈব বিষয়াদিও বড়ো অদ্ভুত, যে-সব জিনিসের জন্য মৃত্যু প্রস্তাব করেছে, সাথে তাদের জন্মের ধারাও প্রতিষ্ঠা করেছে আর যে-সব জিনিসের সাথে মৃত্যু ছিল না, সেখানে এই ধারাই রাখে নি। মানুষ যদি জন্ম নিত আর মৃত্যুবরণ না করত তাহলে কয়েক বছরেই পৃথিবীর বিনাশ ঘটত। তাই তার সাথে মৃত্যুকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। আর সূর্য ও চন্দ্র এবং পৃথিবী নতুন জন্ম নেয় না আর পূর্বেরগুলোও ধ্বংস হয় না। এই ব্যবস্থাপনা কি কম আশ্চর্যজনক যে, পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে যেহেতু আকর্ষণ রেখেছেন তাই তাদেরকে পরস্পর থেকে এতটা দূরত্বে রেখেছেন, যেন তাদের মাঝে সংঘর্ষ না হয়! এসব কথা কি এই বিষয়টি প্রমাণ করে না যে, এ সবকিছুর স্রষ্টা তিনি— যিনি শুধু সর্বজ্ঞই নন বরং অসীম জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর নিয়মনীতি এমনই সুশৃঙ্খল, সেগুলোতে সামান্যতম বিরোধ নেই আর না কোনো ত্রুটি আছে। আমার কাছে তো নিজের আঙুলগুলোও তাঁর সত্তার একটি প্রমাণ মনে হয়। আমাকে যেখানে জ্ঞান দান করা হয়েছে সেখানে যদি বাঘের থাবা দেওয়া হতো তাহলে তা দিয়ে আমি কি লিখতে পারতাম? বাঘকে জ্ঞান দেন নি, বরং তাকে থাবা দিয়েছেন। আমাকে জ্ঞান দিয়েছেন এবং লেখার জন্য আঙুলও দিয়েছেন।

বিভিন্ন রাজ্যে হাজারো পরিকল্পনাকারী সেগুলোকে সঠিক পরিচালনার জন্য দিনরাত মগ্ন থাকে, কিন্তু তারপরও দেখা যায় যে, তাদের দ্বারা এমনসব ভুল সাধিত হয় যেগুলোর কারণে রাজ্যসমূহের ভয়াবহ ক্ষতি হয়ে যায়, বরং কোনো কোনো সময় (তা) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। আর এই পৃথিবীর কর্মকাণ্ড যদি কেবল ঘটনাচক্রের ওপর নির্ভরশীল হয় তাহলে আশ্চর্যের বিষয় হলো, হাজার হাজার বিচক্ষণ মস্তিষ্ক ভুল করে ঠিকই, কিন্তু ঘটনাচক্র কখনও ভুল করে না!

সত্য কথা হলো, এই বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা আছেন যিনি মহাবিশ্বের মালিক ও পরাক্রমশালী আর এমনটি যদি না হতো তাহলে এই সুব্যবস্থাপনা দেখা যেত না। এখন যদি কেই দৃষ্টিপাত করবে, পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও বিফল হয়ে ফিরে আসবে আর প্রতিটি জিনিসের মাঝে একটি সুব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হবে। পুণ্যবানরা পুরস্কার পাচ্ছে আর পাপীরা পাচ্ছে শাস্তি। প্রতিটি জিনিস তার ওপর ন্যস্ত কাজ করেছে আর এক মুহূর্তের জন্য অলস হয় না। এটি অনেক বিস্তারিত একটি বিষয়, কিন্তু আমি এটিকে এখানেই শেষ করছি। বুদ্ধিমানের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

ষষ্ঠ প্রমাণ

পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়- আল্লাহ্ তা'লার অস্বীকারকারীরা সর্বদা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়, আর এটিও তাদের মিথ্যাবাদী হবার একটি প্রমাণ, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মান্যকারীদের সর্বদা বিজয় দান করেন আর তারা তাদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়। কোনো খোদা যদি না থাকে তাহলে এই সাহায্য ও সহযোগিতা কোথা হতে আসে? যেমন- ফেরাউন মূসা (আ.) সম্পর্কে বলে,

(আন-নাযিআত: ২৫-২৬) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخْزَى وَالْأُولَى

অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.) যখন তাকে আল্লাহ্র আনুগত্য সম্পর্কে বলেন, তখন সে অহংকারবশত উত্তর দিয়ে বলে, খোদা আবার কী জিনিস- আমিই তো খোদা! অতএব খোদা তা'লা তাকে ইহজগতেও আর পরকালেও লাঞ্ছিত করেন। অতএব ফেরাউনের ঘটনা একটি স্পষ্ট প্রমাণ যে, কীভাবে খোদার অস্বীকারকারীরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হতে থাকে। এছাড়া পৃথিবীতে নাস্তিকরা কখনও কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নি, বরং বিশ্ব বিজয়ী এবং বিভিন্ন দেশের সংস্কারক আর ইতিহাস গড়ার কারিগর তারা- যারা খোদার মান্যকারী। (অতএব) তাদের এই লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা এবং জাতি হিসেবে কখনও জগদ্বাসীর সামনে আত্মপ্রকাশ করতে না পারা কি কোনো অর্থ রাখে না?

সপ্তম প্রমাণ

আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের সপ্তম প্রমাণ হলো, তাঁর সত্তার মান্যকারী ও তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং তাঁর সত্তায় প্রকৃত অর্থে বিশ্বাসীরা সর্বদা সফলতা লাভ করে। মানুষের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের ওপর কোনো বিপদ আসে না। খোদার সত্তায় বিশ্বাস সৃষ্টিকারীরা সকল দেশেই সৃষ্টি হয়েছে আর যতটা তাদের বিরোধিতা হয়েছে ততটা আর কারো হয় নি, কিন্তু তবুও জগদ্বাসী তাদের বিরুদ্ধে কিবা করতে পেরেছে? রামচন্দ্রকে বনবাসে প্রেরণকারীরা কী সুখ পেয়েছে? আর রাবন কোন আনন্দ লাভ করতে পেরেছে? রামচন্দ্রের নাম কি হাজার বছরের জন্য অমর হয়ে যায় নি আর রাবনের নাম কি চিরতরে দুর্নাম হয়ে যায় নি? কৃষ্ণ (আ.)-এর কথা অমান্য করে কৌরবদের কী উপকার হয়েছে? তারা কি কুরুক্ষেত্রের ময়দানে ধ্বংস হয় নি? ফেরাউন বাদশা, যে বনী ইসরাঈল জাতির দ্বারা ইট বানানোর কাজ করাতো, সে মূসা (আ.)-এর ন্যায় অসহায় ব্যক্তির বিরোধিতা করেছে, কিন্তু মূসা (আ.)-এর কোনো ক্ষতি করতে পেরেছে কি? সে নিমজ্জিত হয়েছে আর মূসা (আ.) বাদশা হয়েছেন। জগদ্বাসী হযরত ঈসা (আ.)-এর যত বিরোধিতা

করেছে তা-ও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট বিষয় আর তিনি যে উন্নতি লাভ করেছেন তা-ও কোনো গোপন বিষয় নয়। তার শত্রুরা ধ্বংস হয়েছে আর তার সেবকরা বিভিন্ন দেশের বাদশাহ হয়ে গেছে। আমাদের মনিব (সা.)-ও পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সেই পবিত্র সত্তার নাম প্রচার করেছেন। এমনকি ইউরোপের এক লেখক বলেছে, খোদার জন্য তাঁর (সা.) ভেতর এক উন্মাদনা ছিল, (নাউযুবিল্লাহ্)। সর্বদা খোদা খোদা জপ করতেন। সাতটি জাতি তাঁর বিরোধিতা করেছে, আপন-পর সবাই শত্রু হয়ে গেছে, কিন্তু এরপর তাঁর হাতে কি পৃথিবীর ধনভাণ্ডারসমূহ বিজিত হয় নি? খোদা তা'লা যদি না থাকেন তাহলে এই সাহায্য-সমর্থন কে যুগিয়েছে? এই সবকিছু যদি কাকতালীয় বিষয় হয়ে থাকে তাহলে কোনো (একজন) প্রেরিতের এমন হওয়া উচিত ছিল যে খোদার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে আসত আর জগৎ তাঁকে লাঞ্ছিত করে দিত। খোদার নাম সম্মুখ করে করার জন্য যে-ই দণ্ডায়মান হয়েছে, সে-ই সম্মানিত হয়েছে ও স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেছে। যেমন- আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

(আল-মায়দা: ৫৭)

অর্থাৎ, আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্ব করে, স্মরণ রাখা উচিত, খোদার মান্যকারীরাই বিজয়ী হয়।

অষ্টম প্রমাণ

পবিত্র কুরআন থেকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের অষ্টম প্রমাণস্বরূপ যা দেখা যায় তা হলো, তিনি দোয়াসমূহ গ্রহণ করেন। কোনো মানুষ যখন বিচলিত হয়ে তাঁর দরবারে দোয়া করে তখন তিনি তা গ্রহণ করেন। আর একথা কোনো বিশেষ যুগে সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল যুগেই এর দৃশ্য দেখা যায়। যেমন- আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا

لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (আল-বাকার: ১৮৭)

অর্থাৎ, আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন তাদের বলে দাও, আমি আছি আর নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শুনি যখন সে আমাকে ডাকে। অতএব তাদেরও আমার কথা মানা উচিত এবং আমার প্রতি ঈমান আনা উচিত যেন তারা হিদায়াত লাভ করতে পারে।

এখন কেউ যদি বলে, খোদা তা'লা দোয়া শোনেন- এটি কীভাবে বোঝা যাবে? এটি কেন বলা হবে না, কেননা কাকতালীয়ভাবে কোনো কোনো প্রার্থনাকারীর কাজ হয়ে যায় আর অনেকের হয়ও না। সবার দোয়া যদি কবুল হতো তাহলেও কথা ছিল, কিন্তু কতকের দোয়া কবুল হওয়ায় কীভাবে বুঝব যে, সেটি কাকতালীয় ছিল না বরং কোনো এক সত্তা তা কবুল করেছেন?

এর উত্তর হলো, দোয়া গৃহীত হওয়া নিজের সাথে নিদর্শন রাখে। যেমন- আমাদের মনিব হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.) আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ এটি উপস্থাপন করেছেন যে, কতিপয় গুরুতর অসুস্থ রোগী নির্বাচন করে ভাগ করে নেওয়া হোক। এক দলের চিকিৎসা করবেন ডাক্তাররা এবং আমার পক্ষের অসুস্থদের জন্য কেবল আমি দোয়া করব। এরপর দেখো! কার ভাগের রোগীরা আরোগ্য লাভ করছে। এভাবে পরীক্ষা করার মাঝে কিবা সন্দেহ থাকতে পারে? যেমন- এক কুকুরের কামড় খাওয়া বালক, যে পাগল হয়ে গিয়েছিল এবং যার চিকিৎসার ব্যাপারে কাসৌলীর ডাক্তাররা পুরো অপারগতা প্রকাশ করেছিল এবং লিখে দিয়েছিল যে, এখন তার আর কোনো চিকিৎসা নেই; সেই বালকের জন্য তিনি (আ.) দোয়া করেছিলেন আর সেই বালক (অবশেষে) সুস্থ হয়ে যায়, অথচ পাগলা কুকুরের কামড় খাওয়া ব্যক্তি যদি পাগল হয়ে যায় তাহলে সে কখনও সুস্থ হতে পারে না।

অতএব দোয়া গৃহীত হওয়া একথার সাক্ষ্য বহন করে যে, এমন কোনো এক সত্তা আছেন যিনি দোয়া কবুল করেন আর দোয়া গৃহীত হবার বিষয়টি কোনো বিশেষ যুগের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল যুগে এর নিদর্শন দেখা যায়। যেভাবে অতীতে দোয়া কবুল হতো, সেভাবে এ যুগেও দোয়া কবুল হয়।

নবম প্রমাণ

পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়- আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের নবম প্রমাণ হলো 'ইলহাম'। আমি যদিও এ প্রমাণটি নয় নম্বরে রেখেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি একটি মহান দলিল যা খোদা তা'লার অস্তিত্বকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে। দেখুন! পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

(ইবরাহীম: ২৮)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা নিজ মু'মিন বান্দাদেরকে এ জগতে এবং পরকালে সুদৃঢ় কথা শুনিয়ে ক্রমাগতভাবে দৃঢ়তা দান করেন। অতএব যেক্ষেত্রে প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্ তা'লা এক বিশাল জনগোষ্ঠীর সাথে বাক্যালাপ করেন সেক্ষেত্রে তাঁকে অস্বীকার করা কীভাবে সমীচীন হতে পারে? তিনি যে কেবল নবী-রসূল (আলাইহিমুস সালাম)-এর সাথেই বাক্যালাপ করেন তা কিন্তু নয়, বরং অলি-আউলিয়ার সাথেও বাক্যালাপ করেন আর অনেক সময় নিজের কোনো দুর্বল বান্দার প্রতি দয়া করে তাকে প্রবোধ দেবার জন্যও কথা বলে থাকেন। যেমন- এ অধমের সাথেও তিনি বাক্যালাপ করেছেন এবং নিজ অস্তিত্বকে প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কেবল তা-ই নয়, বরং অনেক সময় একেবারেই অপবিভ্রচেতা ও নোংরা হৃদয়ের লোকদের সাথেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য বাক্যালাপ করে থাকেন। অনেক সময় মেথর, চোর-চামার এমনকি বেশ্যারাও সত্য স্বপ্ন দেখে এবং ইলহামও হয়, যা একথার প্রমাণ বহন করে যে, কোনো মহান সত্তার পক্ষ থেকে এটি হয়েছে বা হয়। অনেক সময় সেসব ইলহামে অদৃশ্যের সংবাদ থাকে যা সময়মতো পূর্ণ হয়ে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করে যে, এটি মানব-মস্তিষ্ক প্রসূত ছিল না এবং হজমের সমস্যার কারণেও এটি হয় নি। অনেক সময় হাজার বছর আগের খবর বলে দেওয়া হয়, যেন কেউ একথা বলতে না পারে, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ স্বপ্নে এসে গেছে। যেমন- তওরাত ও পবিত্র কুরআনে খ্রিস্টানদের সেসব উন্নতির কথা পূর্বেও পরিষ্কার ভাষায় সবিস্তারে উল্লেখ ছিল যেগুলো দেখে এখন জগৎ বিস্মিত। শুধু তা-ই নয়, বরং সেসব ঘটনার উল্লেখও (কুরআনে) আছে যেগুলো ভবিষ্যতে ঘটতে যাচ্ছিল।

প্রথমত-

(আত-তাকভীর: ৫) وَإِذَا الْعِشَاءُ عُطِّلَتْ

অর্থাৎ এমন এক যুগ আসতে যাচ্ছে যখন উষ্ট্রীগুলো বেকার হয়ে যাবে। আর মুসলিম শরীফের হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা লেখা আছে তা হলো,

(সহীহ মুসলিম) وَلَيُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا

অর্থাৎ কোনো কাজে উট ব্যবহার করা হবে না। যেমন- এ যুগে রেল চলাচলের মাধ্যমে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। রেলগাড়ি সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর বাণীতে এমন এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যার ফলে রেলের (বাস্তব) চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং সুনিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতেও এমন বাহনের কথা বুঝানো হয়েছে যা বাষ্প দ্বারা চলবে এবং এর সম্মুখভাগে ধূমপাহাড় থাকবে আর

যাত্রী বহন ও মালামাল বহন করার নিরিখে গাধার ন্যায় হবে, এমনকি চলার সময় একপ্রকার শব্দ করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত-

(আত-তাকভীর: ১১) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

অর্থাৎ, বইপুস্তকের বহুল প্রচার ও প্রসার হবে। বর্তমানে ছাপাখানা আবিষ্কৃত হবার ফলে যে হারে বইপুস্তক ছাপানো হচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তৃতীয়ত-

(আত-তাকভীর: ৮) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

মানবজাতির পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়া এবং দেখা সাক্ষাতের উপায় এতটা সহজ হওয়া এ যুগের পূর্বে কল্পনাও করা যেত না।

চতুর্থত-

(আন-নাযিআত: ৭-৮) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ

ক্রমাগত ও অসাধারণ ভূমিকম্পের আগমন, এমনকি ভূমি ভয়ানকভাবে প্রকম্পিত হওয়া। এ যুগটি এর জন্য বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

পঞ্চমত-

(বনী ইসরাঈল: ৫৯) وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا

এমন কোনো জনপদ নেই যেটিকে আমরা কিয়ামতের অনতিপূর্বে ধ্বংস করব না অথবা শাস্তির কিয়দংশ এর ওপর আপতিত করব না।

তদনুযায়ী এ যুগে প্লেগ এবং ভূমিকম্প আর বাড়তুফান ও আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ এবং পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহের ফলে মানুষ ধ্বংস হচ্ছে। এত পরিমাণ মৃত্যুর উপকরণ এ যুগে জড়ো হয়েছে আর এত প্রবলভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে যে, এ সবকিছু সার্বিকভাবে দেখলে এমন দৃষ্টান্ত পূর্বের কোনো যুগে দেখা যায় না। এছাড়া ইসলাম এমন এক ধর্ম, প্রত্যেক শতাব্দীতে এর অনুসারীদের মাঝে এমন মানুষের জন্ম হয় যারা খোদার পক্ষ থেকে ইলহাম লাভ করেন এবং অলৌকিক নিদর্শনাবলি দ্বারা প্রকাশ করে থাকেন— এক সর্বশক্তিমান এবং সুপরিকল্পক সত্তা আছেন।

দেখুন! এ যুগের প্রত্যাдиষ্ট ব্যক্তির প্রতি একান্ত অসহায় ও অপরিচিত অবস্থায় খোদা তা'লা ওহী করে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي خَلَقْتُكُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَمِيQِي يَنْصُرُكُ رِجَالٌ تُؤْتِيهِمُ مِنَ السَّمَاءِ ؕ وَلَا تُصَعِّرْ خَلْقَ اللَّهِ ؕ وَلَا تَسْتَكْمِرْ مِنَ النَّاسِ

(বারাহীনে আহমদীয়া, প্রকাশকাল ১৮৮১, পৃ. ২৪১, রূহানী খাযায়েন, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬৭, টীকা দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ, প্রত্যেক পথ বেয়ে মানুষ তোমার কাছে আসবে আর এত অধিকহারে আসবে যে, সেই পথও খানাখন্দে রূপান্তরিত হবে। তোমাকে সেসব লোক সাহায্য করবে যাদের হৃদয়ে আমরা প্রেরণা সঞ্চর করব, কিন্তু খোদার বান্দাদের মাঝ থেকে যারা তোমার কাছে আসবে তাদের সাথে তুমি দুর্ব্যবহার করো না এবং তাদের সাথে সাক্ষাতে তুমি ক্লান্তি প্রকাশ করো না। এক নিভৃত পল্লিতে বসবাসকারী এক ব্যক্তি যার নাম সম্পর্কে সভ্য জগতের কেউ অবগত ছিল না, তিনি উক্ত ঘোষণা দিচ্ছেন আর প্রবল বিরোধিতা এবং প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জগৎ দেখেছে— আমেরিকা এবং আফ্রিকা থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর সকল প্রান্তের লোক এখানে (তথা কাদিয়ানে) আসে। মানুষের সংখ্যাধিক্যের চিত্র হলো, তাদের সবার সাথে কর্মমর্দন এবং সাক্ষাৎ করা কোনো সাধারণ মানুষের কাজ নয়। একটি বিশাল দল নিজ প্রিয় আবাসভূমি ছেড়ে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে এবং কাদিয়ানের নাম সমস্ত বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছে। এটি কি কোনো সামান্য বিষয় এবং এটি কি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখার মতো কোনো সাধারণ নিদর্শন?

দ্বিতীয়ত, খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে (আলেকজান্ডার) ডুই আমেরিকায় নবুওয়তের দাবি করে এবং নিজের এই অপবিত্র বাণী প্রচার করে যে, “আমি খোদার কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন সেই দিন অচিরেই দেখান যেদিন পৃথিবী থেকে ইসলাম ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে, হে খোদা! তুমি এমনই করো, হে খোদা! তুমি ইসলামকে ধ্বংস করো।” সেসময় একমাত্র আমাদের ইমাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই ছিলেন, যিনি তার মোকাবিলায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন— হে নবুওয়তের দাবিদার ব্যক্তি! আসো এবং আমার সাথে মুবাহেলা করো। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে দোয়ার মাধ্যমে এবং আমরা উভয়ে খোদার কাছে এই দোয়া করব যে, আমাদের মাঝে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, সে যেন প্রথমে ধ্বংস হয়। (টেলিগ্রাফ, ৫ জুলাই, ১৯০৩)

অথচ সে দম্ভভরে বলে, তোমরা কি মনে করো, আমি এমন মশা-মাছির জবাব দেবো? আমি যদি আমার পা এদের ওপর রাখি তাহলে এদেরকে পিষ্ট করে মেরে ফেলতে পারি (ডুই কা পারচা, ডিসেম্বর ১৯০৩)। আর হুযর (আ.) বলেছিলেন, ২৩ আগস্ট ১৯০৩ সালে ছাপানো একই বিজ্ঞাপনে বলেন, “ডুই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে পালালেও তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে নিও, তার সেহন শহরের ওপর আশু বিপদ অবতীর্ণ হতে চলেছে। হে খোদা, হে কামেল খোদা! তুমি দ্রুতই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করো এবং ডুইয়ের মিথ্যা, মানুষের সামনে প্রকাশ করে দাও।” সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এরপর কী হলো শুনুন। ডুই- যে রাজপুত্রের জীবন কাটাতো, যার কাছে সাত কোটি নগদ অর্থ ছিল, তার স্ত্রী-সন্তান তার শত্রু হয়ে যায় আর পিতা নিজ পুত্রের ব্যাপারে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে যে, তার ছেলে হলো অবৈধ সম্পর্কের ফসল। অবশেষে সে নিজে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। এরপর খোদা তা'লা যেভাবে তাঁর প্রত্যাдиষ্ট মহাপুরুষকে পূর্বেই সুসংবাদ দিয়েছিলেন, (সেভাবেই সে) শোকে সে পাগল হয়ে যায়। হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭ সালে এ মর্মে ইশতেহারে প্রকাশ করেছিলেন- খোদা বলেন, “আমি এক তাজা নিদর্শন প্রকাশ করব যাতে অন্তর্নিহিত থাকবে মহাবিজয় আর তা সমস্ত জগতের জন্য এক নিদর্শন হবে।” তদনুযায়ী ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে দুঃখ ও পরিতাপের সাথে সে ধ্বংস হয়ে খোদা তা'লার অস্তিত্বের এক জ্বলন্ত প্রমাণ রেখে যায়। এটি ছিল নতুন ও পুরোনো উভয় খ্রিষ্ট-জগতের ওপর হুযর (আ.)-এর মহাবিজয়।

তৃতীয়ত, এ দেশে আর্যদের আধিপত্য বিদ্যমান এবং তাদের নেতা ছিল (পণ্ডিত) লেখরাম। কেরামাতুস সাদেকীন পুস্তকে ১৩১১ হিজরী সনের সফর মাসে [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)] এই ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেন, লেখরাম সম্পর্কে খোদা তা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করে আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, সে ছয় বছরের মধ্যে ধ্বংস হবে আর তার অপরাধ হলো, সে খোদা তা'লার নবী (হযরত মুহাম্মদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয় এবং নোংরা ভাষায় তাঁর অবমাননা করে। এরপর ১৮৯৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারির বিজ্ঞাপনে সে কীভাবে নিহত হবে সেকথাও উল্লেখ করেন,

عَجِّلْ جَسَدَهُ خُورًا لَهُ نَصَبٌ وَعَذَابٌ

অর্থাৎ লেখরাম হলো সামেরীর বাছুর, যে প্রাণহীন আর তার মাঝে কেবল এক ধরনের আওয়াজ আছে। যার মাঝে কোনো আধ্যাত্মিকতা নেই আর তাই তাকে সেই শাস্তি দেওয়া হবে, যে শাস্তি সামেরীর বাছুরকে দেওয়া হয়েছিল। সবারই জানা আছে, সামেরীর বাছুরকে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল, এরপর পুড়িয়ে ছাই করে তা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

এরপর ১৮৯৩ সালের ১২ এপ্রিল তিনি (আ.) একটি কাশফ বা দিব্যদর্শনে দেখেন।
(বারাকাতুদ দোয়া পুস্তকের টীকা দ্রষ্টব্য, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩)

একজন শক্তিশালী ভয়ংকর চেহারার লোক, যে মানুষ নয় বরং কঠোর ফেরেশতাদের একজনএ সে জিজ্ঞেস করে, লেখরাম কোথায়? এরপর কেরামাতুস সাদেকীনের এই পণ্ডক্তিতে দিনও উল্লেখ করে দিয়েছেন—

وَبَشِّرْنِي رَبِّي وَقَالَ مُبَشِّرًا
سَتَعْرِفُ يَوْمَ الْعِيدِ وَالْعِيدُ أَقْرَبُ

অর্থাৎ, ঈদের দ্বিতীয় দিন শনিবার

“আলা আয়ে দুশমনে নাদানো বে রাহ
বেতারস আয তীগে বুর্রানে মুহাম্মদ” (সা.)

(অর্থাৎ, হে নির্বোধ ও পথভ্রষ্ট শত্রু! মুহাম্মদের তরবারি দ্বারা কর্তৃত হবার ভয় করো)

তিনি পাঁচ বছর পূর্বে (একথা) প্রকাশ করে নিহত হবার চিত্রও তুলে ধরেন। অবশেষে ১৮৯৭ সালের ৬ মার্চ লেখরামকে হত্যা করা হয় আর সবাই একবাক্যে মেনে নেয়— ‘এই ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের অকাট্য দলিল প্রমাণিত হয়েছে’। অতএব ঐশী ইলহাম এমন এক বিষয় যে, এর উপস্থিতিতে খোদা তা'লাকে অস্বীকার করা হবে চরম নির্লজ্জতা।

দশম প্রমাণ

প্রত্যেক বিতণ্ডা নিরসনের জন্য পবিত্র কুরআন দশম প্রমাণ হিসেবে যেটি বর্ণনা করেছে, সেটি নিম্নোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়:

(আল-আনকাবূত: ৭০) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থাৎ, যারা আমাদের বিষয়ে চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে, তাদেরকে আমরা আমাদের পথ দেখাই।

এ আয়াত অনুসারে যারা কাজ করেছে তারা সর্বদা লাভবান হয়েছে। যে ব্যক্তি খোদা তা'লার অস্তিত্বে অস্বীকারী, তার তো অবশ্যই ভাবা উচিত— সত্যিই যদি খোদা থেকে

থাকেন তাহলে তার জন্য অনেক বিপদ অপেক্ষমাণ রয়েছে। অতএব এই ভাবনায় যদি সত্য সন্ধানের জন্য তার হৃদয়ে উৎকর্ষা থাকে তাহলে তার উচিত বিগলিত চিন্তে পরম শক্তি কাজে লাগিয়ে এভাবে দোয়া করা— হে খোদা! সত্যিই যদি তুমি থেকে থাকো, আর যেভাবে তোমার মান্যকারীরা বলে থাকে, তুমি অসীম শক্তির অধিকারী, (ঠিক সেভাবে) তুমি আমার প্রতি কৃপা করো এবং আমাকে তুমি হিদায়াত দান করো আর আমার হৃদয়কে ঈমান ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ করো, যেন আমি বঞ্চিত না থাকি।

এভাবে সত্য অন্তঃকরণে কোনো ব্যক্তি যদি দোয়া করে আর কমপক্ষে চল্লিশ দিন পর্যন্ত এর ওপর আমল করে তাহলে সে যে ধর্মেই জন্ম নিক না কেন আর সে যে দেশের অধিবাসীই হোক না কেন, রাক্বুল আলামীন অবশ্যই তাকে হিদায়াত দান করবেন। আর সে অচিরেই প্রত্যক্ষ করবে, আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে তাঁর অস্তিত্ব তার কাছে প্রমাণ করবেন যে, তার হৃদয় থেকে সন্দেহের নোংরামি সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যাবে। আর এটি তো স্পষ্ট বিষয় যে, এই পদ্ধতির মীমাংসায় কোনো প্রতারণা থাকতে পারে না। অতএব সত্যান্বেষীদের জন্য এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা কী এমন কঠিন বিষয়?

আপাতত এই দশটি প্রমাণ দিয়েই আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করছি। যদিও পবিত্র কুরআনে আরো প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু আমি আপাতত এগুলোর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলাম। আর কেউ যদি এগুলো নিয়ে প্রণিধান করে তাহলে এর মাঝে থেকেই তার জন্য আরো প্রমাণ বেরিয়ে আসবে আর আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে সাহায্যকারী।

পরিশেষে আমি যাদের হাতে এই পুস্তিকা পৌঁছাবে সেসব লোককে বলব, তারা যেন এটি পাঠ করার পর কোনো এমন বন্ধুকে দিয়ে দেয়, যার জন্য এটি কল্যাণকর মনে করবে। (তাহসীলুল আযহান, মার্চ ১৯১৩) (আনোয়ারুল উলুম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১১)



Ten Proofs for the Existence of God

Ten Proofs for The Existence of God is an elegane and thoughtful disposition of the proofs God's existence found in the Holy Quran. From the principle that the loved ones of Fod always meet with success to the moral awareness for human beings to the fine-tuning of the universe, Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad^{ra}, the second successor of the Promised Messiah^{as}, sets forth ten Quranic arguments to show with compelling force that the existence of God can be established with full certainty and in a manner which is beyond refute.

